নারীর প্রতি সহিংসতা ও পুরুষের দায়

এমএম কবীর মামুন

বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশেই নারীরা নির্যাতনের শিকার হয়। তবে বাংলাদেশে এর মাত্রাটা অনেক বেশি, বিভিন্ন গবেষণায় তা প্রমাণিত। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায় দেশের প্রতিটি কোণে কোণে নারীর প্রতি সহিংসতার খবর। আরো লাখো নারী অনেক নির্যাতন সয়েও থেকে যায় নীরব। কোথাও তারা কোনো অভিযোগ করে না। পুরুষ যেমন মনে করে তার স্ত্রীকে বা নারীকে নির্যাতন করাটা তার অধিকার, তেমনি দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক নারীও বিশ্বাস করে যে তাকে শাসন (মারধর ও অন্যান্য কায়দায়) করাটা তার স্বামীর অধিকার। আমাদের সমাজ এবং ধর্মগুলো তা-ই শিক্ষা দেয় আমাদের। ধর্মগুলোতে যেমন নারীর কর্তৃত্ব পুরুষের হাতে অর্পণ করা হয়েছে, তেমনি আমাদের সমাজও নারীকে তার জীবনের শুরু থেকে বড়ো হয়ে ওঠবার প্রতিটি পর্যায়ে তাকে হাতে ধরে ও চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছে যে এটাই নিয়ম। পুরুষ পেটাবে আর নারী পিটুনী খাবে। এভাবেই দিন চলে যাবে। পৃথিবী এজন্যই তৈরি হয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা কেন হয়? এজন্য কে দায়ী? কীভাবে এই সহিংসতা বন্ধ করা যাবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর পুরুষদের জিজ্ঞাসা করলে বেশিরভাগ পুরুষের থেকেই যে উত্তরগুলো পাওয়া যায় তা হলো, ১. নারী মার খায় নিজের দোষে; ২. নারীর প্রতি সহিংসতার জন্য নারীরাই দায়ী এবং ৩. নারী নিজে ঠিক হলেই সকল সহিংসতা বন্ধ হয়ে যাবে। এগুলো হলো এক কথায় উত্তর। এসব উত্তর ধরে পালটা প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় : সংসারের দিকে তাকান, বেশিরভাগ নারীকে নির্যাতন করে তার শাশুড়ি কিংবা ননদরা; মায়েরাই ছেলের বউদের নির্যাতন করে; নারী বেশি বোঝে, তাই মার খায়; বেশি না বুঝলেই হয়; সংসারের শান্তিটাই আসল বিষয়, কীভাবে শান্তি আসবে তা নারীকেই ম্যানেজ করতে হবে; ইত্যাদি ইত্যাদি।

সবকটি প্রশ্নের সব উত্তর পর্যালোচনা করলে একটি মাত্র বিষয়ই বের হয়ে আসে, আর তা হলো : পুরুষ নিজে নির্যাতন ও সহিংসতার দায় নিতে চায় না। সকল দায় নারীর ওপর চাপাতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু এই দায় আসলে কার? নারীর নাকি পুরুষের? নারীর প্রতি সহিংসতার রাশ টেনে ধরতে হলে পুরুষের এই অভিযোগের যথার্থতা খুঁজে দেখাটা খুবই জরুরি।

নারীর প্রতি সহিংসতার দায় কার? এই প্রশ্নের উত্তরে বেশিরভাগ নারীর কাছ থেকেই সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। সঠিক উত্তর না পাওয়ার পিছনেও রয়েছে হাজারো কারণ।

অধিকাংশ নারীই সত্য কথাটা বলতে ভয় পায়। কারণ তারা পুরুষের সমাজে অসহায়। প্রায়ই তাদের এই নিপীড়ন মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তাই তারা নীরব থাকে। কারণ পুরুষ বলেছে, তুমি রবে নীরবে...! তাই সবই মেনে নিতে হবে, তা সে ভালো হোক কিংবা মন্দ। পছন্দ হোক আর নাই হোক। ভালো লাগুক আর নাই লাগুক। মারুক আর পিটুক। কারণ মানিয়ে চলতে পারাটাই যোগ্যতার পরিচয় আমাদের সমাজে। বিজ্ঞানী ডারউইন বলেছেন, যারা সারভাইভ করতে পারবে তারাই টিকে থাকবে। তাই সবাই ভাবে, যেকোনোভাবেই হোক সারভাইভ করাটাই শেষ কথা। সেটা পিঁপড়ে বা তেলাপোকা যার মতোই হোক না কেন। তাই নেই কোনো প্রশ্ন আর, নেই কোনো উত্তর। এরই নাম কখনো কখনো নারী। তাই নারী ভদ্র, নারী লাজুক, নারী কাঁদে নীরবে, নারী হাসে মুখ লুকিয়ে, নারী চলে শব্দহীনভাবে, নারী... আরো কত কী! কিন্তু এমনভাবে কত হাজার বছর চলতে পারে কিংবা চলা সম্ভব? একসময় প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে সবার অজান্তেই। আর এখন তা প্রকাশিত দিনের আলোর মতো সত্য।

সমাজবিজ্ঞানী মিশেল ফুঁকো বলেছিলেন, যেখানে ক্ষমতা আছে, সেখানেই প্রতিরোধ আছে। পুরুষের দীর্ঘদিনের ক্ষমতা কাঠামো এবং ক্ষমতার চর্চাকে 'না' বলাই এই সহিংসতার অন্যতম মূল কারণ। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় বাংলাদেশসহ প্রতিটি সমাজে নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কটি হলো শতভাগ ক্ষমতার সম্পর্ক। এখানে প্রতিটি সামাজিক সম্পর্ক ক্ষমতার সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে পুরুষ ক্ষমতাবান আর নারী ক্ষমতাহীন। ক্ষমতাহীনকে আরো ক্ষমতাহীন করা অথবা ক্ষমতাবানের ক্ষমতা জাহির করা যেকোনো একটি অথবা দুটি কারণের মিলনেই সংঘটিত হয় নারীর প্রতি সহিংসতা।

নারীর প্রতি সহিংসতার মধ্যে ক্ষমতা প্রদর্শনের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম উদাহরণ হলো ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ কিংবা হত্যা। এ ছাড়াও আরো হাজারো নিপীড়নের ধরন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থায় প্রচলিত রয়েছে। কী কী ধরনের নিপীড়ন সমাজে প্রচলিত রয়েছে, তা আমরা জানি এবং বিজ্ঞজনেরাও তা সনাক্তও করেছেন। দেশের হাজারো এনজিও এবং সরকার কাজ করছে সমাজ থেকে নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করতে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। সকলেই শুধু সচেতনতা বৃদ্ধির নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। কিন্তু কাজ কি কিছু হচ্ছে তাতে? সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ বলছেন যে কাজ হচ্ছে। নারীরা সচেতন হয়েছে। কিন্তু কী কাজ হচ্ছে তা একটু বুঝে দেখবার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথমত, নারীর প্রতি সহিংসতার রিপোর্টিং বেড়েছে। এটা একটা উল্লেখ করবার মতো বিষয়। আগে নারীর প্রতি সহিংসতা হতো কিন্তু নারীরা মুখ বুজে তা সহ্য করত। কোনো কথা বলত না লোকলজ্জা বা সম্মানহানীর ভয়ে। কিংবা স্বামীর সম্মান কমে যাওয়া বা সংসার ভেঙে যাবার ভয়ে অথবা নিয়তি জেনে। কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নেই। এখন নির্যাতনের শিকার নারীরা আর মুখ বুজে বসে থাকছে না। তারা সহিংসতার রিপোর্ট করছে। তবে এখানে প্রশ্ন হলো রিপোর্টিং তো বাড়ছে, কিন্তু রিপোর্টিংয়ের ফলে কি সহিংসতার হার কমছে?

সরকার এবং এনজিওদের এত প্রচারাভিযানের পরও শিশুবিবাহের হার বাংলাদেশে সর্বোচ্চ। এখানে এখনো ৬৫ শতাংশ নারীর ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে হয়, যাদের ২৯ শতাংশের বয়স ১৫ বছরের নিচে।[১] এর উপর আবার বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে বাল্যবিবাহ আইনের সংশোধন। ১৯২৯ সালের আইন যেখানে মেয়েদের বিয়ের বয়সসীমা ১৮ বছর ঠিক করেছিল, সেখানে বর্তমান সরকার তাকে অপশন রেখে ১৬ বছরে নামিয়ে এনেছে। যা ভবিষ্যৎকে আরো হুমকির মুখে ফেলবে বলে ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশে যৌতুক সমস্যা বিষয়ক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৩০ শতাংশ পরিবার মনে করে, যৌতুক ছাড়া বিয়ে হতেই পারে না।[২] যারা মুখে যৌতুক চায় না তারা ভাবে বুঝিয়ে দেয়। আবার দেখা যায়, যৌতুকের দাবিতে সহিংসতার শিকার হয়ে হাজারো নারীকে হত্যা করা হয়। অধিকাংশ বিয়েতেই টাকাপয়সা এবং সম্পদের বিনিময় হয়।

পারিবারিক সহিংসতার অবস্থা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব, সেখানে নারীর অবস্থা আরো নাজুক। বিবিএস ২০১১ সালে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে যে গবেষণা করে তাতে দেখা যায়, ৮১.৬ শতাংশ নারী তার স্বামীর দ্বারা মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। ৬৪.৬ শতাংশ নারী পরিবারে তার স্বামীর দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হন। এ ছাড়াও, ৫৩.২ শতাংশ নারী অর্থনৈতিক নিপীড়ন এবং ৩৩.৫ শতাংশ নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হন।[৩]

এভাবে তথ্য উপাত্ত ধরে যদি আলোচনা করা যায়, তাহলেই নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিটি ধরনের অবস্থা পরিষ্কার হয়ে উঠবে চোখের সামনে। আর এই যদি হয় প্রকৃত চিত্র, তবে প্রশ্ন জাগে, এত সচেতনতামূলক কথাবার্তা বলে কি কোনো ফায়দা হচ্ছে আদৌ? বিষয়টি বিজ্ঞজনেরা ভেবে দেখতে পারেন।

নারীর প্রতি সহিংসতার যে সকল ধরন রয়েছে, তার প্রতিটিকেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সংবিধান এবং দেশে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হিসেবে ঘোষণা করেছে। অনেকগুলো ধরনের ক্ষেত্রে সরাসরি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে সহিংসতা বন্ধ করা এবং নারী-পুরুষ সমতাপূর্ণ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে। তবু কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছে না নারীর প্রতি সহিংসতা। বরং ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে এই সহিংসতা আমাদের সমাজে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এ অবস্থায় আমাদের সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করার উপায় কী?

নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে চাইলে এর মূল কারণগুলোর মূলোৎপাটন করা জরুরি। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হলো সহিংসতার দায় কেউ নিতে চায় না। সহিংসতার শিকার নারী জানে না এজন্য দায়ী কে। আর সহিংসতা সংঘটনকারীরা এর দায় নারীর কাঁধে চাপিয়ে দিব্যি নিজের স্বার্থ হাসিল করে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের সরকারি এবং বেসরকারি যে সকল উদ্যোগ রয়েছে তারা সবাই নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলা করবার জন্য নারীকে সচেতন করে তুলবার কাজ করছে দীর্ঘ

---

[১] http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/bangladesh/

[২] http://www.ijias.issr-journals.org/

[৩] http://203.112.218.66/WebTestApplication/userfiles/Image/Latest%20Statistics%20Release/VAW_Survey_2011.pdf

সময় ধরে। মজার বিষয় হলো ক্ষমতাহীন মানুষকে সচেতন করে কি কোনো লাভ হয়, যখন তার পক্ষে প্রতিবাদের জন্য সংগঠন না থাকে?। সমাজের সর্বময় ক্ষমতা যখন পুরুষের হাতে তখন নারীর সচেতনতাকে থোরাই কেয়ার করে এই পুরুষালি সমাজ। আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ থেকে এশিয়া সব সমাজের ক্ষমতাই পুরুষের হাতে। তাই প্রতিটি সমাজেই নারীর প্রতি সহিংসতা সংঘটিত হয়। পাশ্চাত্যের মানুষ অনেক সচেতন বলেই আমরা জানি। তবে সেসব দেশে কেন নারীর প্রতি সহিংসতা হয়? আসলে সচেতনতা-অসচেতনতার ওপর সহিংসতার কারণ ও ফলাফল নির্ভর করে না।

নারীর প্রতি সহিংসতা একটি জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা। এটি নিছক কোনো সহিংসতা নয়। সমাজে যে লৈঙ্গিক অসমতা বিরাজমান, তারই বহিঃপ্রকাশ হলো এই সহিংসতা। পুরুষালি সমাজের ক্ষমতার দম্ভের নগ্ন প্রকাশ হয় এই সহিংসতার মধ্য দিয়ে। এখানে মেরে আহত করে, ভয় দেখিয়ে, হত্যা করে, ধর্ষণ করে, অ্যাসিড ছুড়ে ক্ষমতার দম্ভ প্রদর্শন করা হয়। নারী কেন কথা শুনবে না? কেন নত হয়ে থাকবে না? যখন ক্ষমতা পুরুষের হাতে, তখন নারী কেন সমতা চাইবে? এ ধরনের অনেক বিষয় কাজ করে ক্ষমতাবানদের ভিতরে।

আমাদের সমাজে শুধু নারী নয়, শিশু, এলজিবিটি এবং ক্ষমতাহীন পুরুষরাও নির্যাতিত হয় ক্ষমতাবান পুরুষদের দ্বারা। কিন্তু কেন? একজন অথবা সংঘবদ্ধ কিছু পুরুষ যখন একটি শিশুকে ধর্ষণ করে কিংবা পিটিয়ে মেরে ফেলে, সেটা হয় ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। আবার একজন পুরুষও হতে পারে সহিংসতার শিকার, যদি সে হয় ক্ষমতাহীন আর প্রতিপক্ষ যদি হয় ক্ষমতাবান। এর প্রমাণ প্রতিনিয়ত পাওয়া যায় আমাদের সমাজে, আশেপাশে। প্রতিদিনই গণমাধ্যমে আমরা জানতে পারি অনেক পুরুষের খুন হওয়া, আহত হওয়ার ঘটনা। এগুলোর সবই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আর ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে সহিংসতার শিকার সকলেই লিঙ্গীয় সহিংসতার শিকার।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীর সংগ্রাম শত বছরের। নারীর সংগ্রাম কি শুধু নারী ইস্যুতে? আমাদের সমাজের প্রচলিত ধারণা হলো নারী-সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ই নারী ইস্যুর অন্তর্ভুক্ত। বিষয়গুলোকে সমাজে এমনভাবে হেজিমোনাইজ করা হয়েছে যে, নারী ইস্যুতে শুধু নারীরাই কথা বলবে। পুরুষ নয়। কালেভদ্রে দুয়েকজন রাজা রামমোহন রায় কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন জন্মালে তারাই নারী ইস্যুতে কাজ করবেন, এত সহজ নয় আধুনিক সমাজ। সমাজ এখন জটিল থেকে ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠেছে। তাই অনেক কাজ করবার রয়েছে বিষয়টি নিয়ে।

আগেই বলেছি আমাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর প্রতি সহিংসতাকে নারীর ইস্যু হিসেবে গণ্য করা হয়। এর বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ ওঠে, সেটাকেও নারীর হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের কাজকেও নারীর ইস্যু হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। মনে পড়ে, ২০০১ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল। আমি সেই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। নারী দিবসের শোভাযাত্রায় আমি অংশ নিয়েছিলাম বলে আমার পুরুষবন্ধুরা আমাকে অনেক অবজ্ঞাসূচক কথা শুনিয়েছিল। অবজ্ঞার হাসি হেসে বলেছিল, 'তুই মেয়ে নাকি? নারী দিবসের র‍্যালিতে গেলি যে!' আমিও অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে

যে, হায় কী শিক্ষা নিয়ে বড়ো হচ্ছি আমরা! এই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের কী শিক্ষা দিচ্ছে? আমরা কি মানুষ হিসেবে তৈরি হচ্ছি আদৌ? নাকি শুধু সার্টিফিকেট নিতে এসেছি?

গ্রামের নিরক্ষর থেকে শহুরে শিক্ষিত সকলেই একই রকমের চিন্তা করে। নারীকে তারা সমাজের অংশ হিসেবে ভাবতেই চায় না। নারীর সমস্যাকে কেউ গুরুত্ব দিতে চায় না। আর দ্বিতীয়ত নারী সমস্যাকে নারীর ইস্যু হিসেবেই বিবেচনা করে। তাই এই সমস্যা নিয়ে হাজার কাজ করবার পরও তা কমছে না বরং নতুন মাত্রা ও আঙ্গিক যোগ হচ্ছে।

যখন একজন পুরুষ একজন নারীকে (স্ত্রী অথবা অন্য কেউ) মারধর করে অথবা একজন নারী একজন পুরুষ (স্বামী অথবা অন্য কেউ) কর্তৃক প্রহৃত হয়, তখন সেটা আর নারীর একার ইস্যু থাকে না। যদিও পুরুষালি সমাজ এটাকে নারী ইস্যু হিসেবে গণ্য করে নারীর ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। কারণ নারীর ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে শোষণের মাত্রা আরো বাড়ানো সহজ হবে। পুরুষতন্ত্র হয়ত নিজেদের স্বার্থকে হাসিল করবার জন্য আপাতত এটাকে নারী ইস্যু বলছে, কিন্তু স্বীকার করুক আর নাই করুক এটা অবশ্যই পুরুষেরও ইস্যু। জেন্ডার ইস্যুটা নারীর পাশাপাশি পুরুষেরও ইস্যু। কারণ দুই পক্ষই এখানে জড়িত। কেউ নিপীড়িত আর কেউ নিপীড়কের ভূমিকায়। ফলে স্বীকার করুক আর নাই করুক, প্রচলিত সহিংসতার দায় এবং দায়িত্ব পুরুষকেই নিতে হবে। কারণ এটা তারই দায়।

একজন যোগ্য ও সঠিক নেতা জাতি কিংবা দেশের দায়িত্ব নেন আর অযোগ্য নেতা দায় অস্বীকার করেন কিংবা অন্যের ওপর দায় চাপিয়ে নিজে ভারমুক্ত হওয়ার ভান করেন। আবার ভানের অন্তরালে নিজের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন। কিন্তু ভান করে বসে থাকলেই কি দায়মুক্ত হওয়া যায়? নিশ্চয়ই যায় না। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নেতৃত্বের ভূমিকায় পুরুষরা চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সমাজ পরিচালনায়। নেতা থেকে তারা শোষক আর নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। নিজেকে প্রমাণ করেছে অযোগ্য নেতা হিসেবে। সুন্দর একটি সমাজ এবং পৃথিবী গড়ে তুলতে চাইলে পুরুষকে অবশ্যই তার হাজার বছরের কৃতকর্মের দায় স্বীকার করতে হবে। আর শুধু দায় স্বীকার করলেই হবে না, সাথে সাথে তাকে দায়িত্ব নিতে হবে নারী, পুরুষ এবং অন্যান্যের জন্য সমতার সমাজ গঠনে।

এ উদ্দেশ্যে পুরুষের জন্য প্রয়োজন নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণের। এখানে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের চেয়ে নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ অনেক বেশি জরুরি। যে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে পুরুষ তার দিকনির্দেশনা খুঁজে পাবে সঠিক নেতৃত্বের। পরিণত হবে রূপান্তরিত নেতায়। পরিচালিত হবে সঠিক রাস্তায়। সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকায় নারীর পাশাপাশি হাতে হাত ধরে এগিয়ে যাবে। নারীর অধিকার আদায়ে নারীর শত বছরের সংগ্রামকে কিঞ্চিৎ নয় পরিপূর্ণ সফল হিসেবে রূপদানে ভূমিকা রাখবে। নারীর প্রতি সহিংসতা থেকে মুক্ত হবে সমাজ। সভ্যতার ইতিহাস হবে কলংকমুক্ত। গড়ে উঠবে সুন্দর আগামী।

এমএম কবীর মামুন উন্নয়ন কর্মী। kabirmamun78@gmail.com